ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1520-1526
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.159

সাহেবধনী সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সঞ্জিত ভক্ত, *গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
সুজয় কুমার মন্ডল, *অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.07.2025; Accepted: 10.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In term of living in a society, we must follow sets of beliefs, customs, rituals and other religious activities. If we tend to analyse the historical aspects of these social factors, we can discover both the scriptural and folk elements in their core formation; and it finds its root back to folklore and folk life. Many religious sub sects were formed beside the mainstream religions. They were emerged to enjoy the freedom, which were an escape of priests and maulavis and their burdens of codes of conducts. One of these sub sects are Sahebdhani sect. The founder of this sect is Muliram Pal. But his son Charan Pal preached this sect and represented it to a huge amount of people. It was emerged in the middle of 18th century in Nadia District. Although it was emerged in Dogachiya, the '*mool asan*' was later shifted to the village named Brittihuda. Every year, the annual mela or festival is celebrated in Agradeep in *Chaitra Ekadashi* and also in Brittihuda village in the auspicious time of *Baishakhi Purnima.* Both the Hindus and Muslims are involved in the religious activities. The mantra is "*Kling Deenanaam Deenabandhu*" for the Hindus and "*Deendayal Deenbandhu*" for the Muslims. Interestingly, the Hindu *bhaktas* have Muslim *gurus* and vice versa. Sahebdhani sect does not uphold discrimination based on race and religion. The chief disciple of Charan Pal is Kubir Gosain who is the chief lyricist of the sect. It is clears from his songs that how much generous the sect is. They represent Hindu-Muslim harmony in this community as in other folk religions. The role of Sahebdhani sect in maintaining communal harmony will be highlighted in the main article.

Keywords: Folk religion, Sahebdhani Sampradaya, Hindu Muslim, Folk Rituals, Communal harmony

আমরা যদি ভালো করে লোকধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব বিভিন্ন সময়ে সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণ থেকে রক্ষা পেতেই, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধীতা করে আনুমানিক ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় বিভিন্ন লোকাধর্ম গড়ে উঠেছিল। বাংলায় গড়েওঠা লোকধর্মের অধিকাংশ প্রবর্তকই একজন মুসলমান অথবা যৌথভাবে হিন্দু-মুসলমান। যাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের সমন্বয় ঘটানো। এসব লোকায়ত ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়। সাহেবধনী সম্প্রদায়ও হিন্দু, মুসলিম ধর্ম সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়া নিবাসী মূলীরাম পাল এবং হিন্দুমতাবলম্বী আরো কয়েক জন ব্যক্তি এবং কয়েক জন মুসলমান ব্যক্তি সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রাথমিক সংগঠন, একজন ফকিরের

সান্নিধ্যে ও উপদেশে গড়ে তোলেন। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মূলীরাম পাল হলেও প্রধান সংগঠক চরণ পাল। চরণ পালের হাত ধরেই এই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নেই। উপাস্য দেবতার কোন সুনির্দিষ্ট মূর্তিও নেই । এই সম্প্রদায়ের উপাস্য গুরুর ছড়ি বা খড়মকে আসনে বসিয়ে পূজা করে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন হলো 'মানুষের করণ' করাই মূল আচরণীয় ধর্মনীতি। মূর্তি পূজা বাদ দিয়ে মানুষের সেবা করা উচিত বলে এঁরা মনে করেন। এই সম্প্রদায়ের মূল কথা হল- 'মানুষ ভজন'। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের এই বিভিন্ন কার্যকলাপ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরিতে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে।

সাহেবধণী সম্প্রদায় ও চরণ পাল: সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক হলেন মূলীরাম পাল। কিন্তু তাঁর পুত্র চরণ পালের সময় এই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটে। নদীয়া জেলায় আনুমানিক ১৮ শতকে মাঝামাঝি সময়ে 'সাহেবধনী' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এদের উদ্ভব স্থল নদীয়ার দোগাছিয়া অঞ্চলে। তবে পরবর্তীকালে এই সম্প্রাদায়ের 'আসন' নদীয়া জেলার চাপড়ার বৃত্তিহুদা গ্রামে স্থাপিত হয়। চরণ পাল ছোটো বেলায় গরু চরাবার সময় এক ফকির এসে দুধ চান এবং তাকে বাজা গরুর দুধ দুইতে বলেন। চরণ পাল দুধ দুইয়ে দেখেন ফকির নেই; তখন ফকিরের পায়ের ছাপ দেখে হাটতে হাটতে চরন পাল ফকির সাথে অগ্রদ্বীপে মিলিত হন। এই পায়ের ছাপ দেখে পৌঁছোনোর জন্য তাঁর নাম হয় চরণ পাল। ফকিরের অনুগ্রহে চরণ পাল হয়ে ওঠেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সেই থেকেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উপাস্য হয়ে ওঠেন চরণ পাল। ঐ ফকিরের আর্শীবাদে চরণ পালের সাত পুরুষ পর্যন্ত বাকসিদ্ধ হয়। তাই চরণ পালের কাছে প্রচুর মানুষও রোগ ব্যাধির থেকে মুক্তির আশায় আসতেন। সেই থেকে বর্তমান সময়েও চরণ পালের বংশধরেরা রোগ ব্যাধির থেকে মুক্তির জন্য ঔষধ দিয়ে থাকে। কুবীর গোঁসাই চরণ পাল ও বৃত্তিহুদা গ্রামের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন লিখেছেন-

"ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট হুদাগ্রাম।
শ্রীপাট হুদাগ্রাম
যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম।।
হেরী নীলাচলে যেমন লীলে
এখানে তার অধিক লীলে
হিন্দু যবন সবাই মিলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম।।।
দ্যাখো গোঁসাই চরণচাঁদ আমার
বসিয়েছে চাঁদের বাজার
ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম।।
আমার চরণচাঁদের নামে জোরে
দুখী তাপী তরে
হাঁপ কাশি শূল গুড়ু মব্যথা
মহাব্যাধি হয় আরাম।।"[১]

চিত্র-১: বৃত্তিহুদা গ্রামের চরণ পালের আসন ঘর মন্দির

এ বিবরণ থেকে চরণ পালের লোকপ্রিয়তা ও তার আসনসিদ্ধ অলৌকিকতার খবর মিলেছে এবং তাঁর নামের জোরে রোগব্যাধি সারে সেই বর্ণনাও পাওয়া যায়।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব, লোকাচার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কয়েকটি অনুষ্ঠান হয় বছরের নির্দিষ্ট তিথিতে। যেমন বৈশাখী পূর্ণিমায় পাল বাড়িতে উৎসব। দ্বিতীয়টি অগ্রদ্বীপে চৈত্র একাদশীতে সাহেবধনীদের তিন দিনের বার্ষিক সমাবেশ ঘটে। এই অনুষ্ঠানে সকল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যোগ দেয়। এই উৎসবে যে ভোগ দেওয়া হয় তা রান্না করা হয় মাটির হাড়িতে ও মাটির উনানে। আর এই ভোগের প্রসাদ সকল জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলে গ্রহণ করে, যা সম্প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ভোগ দেওয়া হয় আতব চাল ও খাঁটি দুধ দিয়ে এবং প্রত্যেকদিন দুপুরে চাল জল দেওয়া হয় আসনে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ে ফকিরের গান করা হয় এই গানের শ্রষ্ঠা কুবের গোঁসাই। চরণ পালের বংশধরদের কবর বা পোড়ানো হয় না, এদের সলিল সমাধি দেওয়া হয়। এই সকল লোকাচার হিন্দু-মুসলমান মিলিত ভাবে পালন করে। মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য এবং

হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য-দুই রকমেই দেখা যায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ নেই, বর্নভেদ নেই। এদের উপাস্য দেবতার কোন সুনির্দিষ্ট মূর্তিও নেই। সাধকরা তাঁদের উপাস্যকে বলেন 'দীনদয়াল' বা 'দীনবন্ধু'। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতি সহজিয়া এবং গুপ্ত পদ্ধতি। তবে অনেকেই এই সাধনপদ্ধতি বর্তমানে পালন করে না। কিন্তু ধর্মের মূল লক্ষ্যকে সবাই অনুসরণ করে। সাহেবধনী সম্প্রদায় কোন মূর্তি পূজা করে না। সাহেবধনী সম্প্রদায়েরা মানুষের অন্তরেই ঈশ্বরকে খোঁজে। তাই ঈশ্বর সেবার নামে এরা মানুষ সেবা করে। অন্যান্য গৌণ সম্প্রদায়গুলির মতো এই সাহেবধনী সম্প্রদায় মানুষের সাথে মানুষের সেতু বন্ধন করে। জাতি, বর্ণ ভুলে সকল মানুষ একসাথে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকার সম্প্রীতির বাণী শোনায়, এবং প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শন হলো 'মানুষের করণ' করাই মূল আচরণীয় ধর্মনীতি। মূর্তি পূজা বাদ দিয়ে মানুষের সেবা করা উচিত বলে মনে করে এরা। সমস্ত ধর্মের মানুষকে একত্রিত করার জন্য এই ধর্মের মন্ত্রগুলি হল —

"আল্লা মোহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সব।"[২]

তাই মানুষে মানুষে ধর্ম ঈশ্বর নিয়ে যে ভেদাভেদ তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সাহেবধনী গানে ব্যক্ত হয়েছে —

"পাহাড় আর পর্বত গাছ পাথর হল মাটিতে
এই মাটিতে তলাতল ভূতল পাতাল নিরাকার।।"[৩]

ঈশ্বর যেহেতু নিরাকার তাঁকে সারা পৃথিবীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই সম্প্রদায়ের মরমী গায়ক গেয়ে ওঠেন —

"ডুব ডুব ডুব রুপ সাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে তুই রত্নধন।"[৪]

সাহেবধনী সম্প্রদায়: কুবীর গোঁসাই, যাদুবিন্দু গোঁসাই ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি: সাহেবধনী সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও ব্যাপকতা দেন চরণ পাল। আর এই চরণ পালের প্রধান শিষ্য কুবীর গোঁসাই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রধান গীতিকার। কুবীর গোঁসাই এবং কুবীর গোঁসাইয়ের শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই এই সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে অনেক গান লিখেছিলেন যা সারা দেশের বাউল ও ফকিরেরা গেয়ে থাকেন। অন্যান্য লোকধর্মের মত এই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সাধনের কথা দেখা গেছে। এই ধর্ম সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এগিয়ে এসছে। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মূল গুরুকে বলা হয় ফকির। তাছাড়া সাহেবধনী সম্প্রদায়ে যে সব গান পাওয়া যায় তার মধ্যে খ্রীষ্টানদের প্রভাব আছে। কারণ সাহেবধনী সম্প্রদায় চাপড়া থানার বৃত্তিহুদা গ্রামে উদ্ভব ঘটেছিল, আর এই বৃত্তিহুদা গ্রামের কাছেই রাণাবন্ধ গ্রামে খ্রিষ্টানদের চার্চ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গানে খ্রিষ্টীয় প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তাই কুবীর গোঁসাইয়ের গানের মধ্যে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় —

"দশ আজ্ঞা পালন কর।
প্রভুর নামের গুনে দিব্যজ্ঞানে ত্রিভূবনে ডংকা মারো।
পরহিংসা কোরো না রে ভাই-
ওরে আপন যেমন পরকে তেমন ভাবো সদাই।
ভাবতে ভাব উপজিবে বাড়িবে প্রেম-অঙ্কুর।।
নিয়ত কর গো প্রভুর নাম
বসে সাধুর সনে চন্দ্রদিনে কর হে বিশ্রাম
প্রার্থনায় করিবেন কৃপা আপনি পরমেশ্বর।।
অতি সুভাবেতে স্বধর্মেতে কর মগন।
জ্ঞান হবে উজ্জ্বল বাতি নামের মালা গলায় পরে।
গোঁসাই চরণ বলে কঠিরকে
প্রেম করো যুতে প্রভুর সাথে পরম সুখে।
শুনো রে সাফ অর্থ বলি ঈষু করিবেন নিস্তার।।"[৫]

চিত্র-২:
কুবীর গোঁসাই-এর আসন ঘর

এই গান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সাহেবধনী ধর্ম মতের উদারতা। এছাড়াও প্রমাণিত হয় এই লোকধর্মে কোন ছুতমার্গ নেই। সাহেবধনী সম্প্রদায় কোন প্রতীক বিগ্রহকে গ্রাহ্য করে না। তাদের বিশ্বাস মানুষ ভজন, তাই কুবীর গোঁসাইর গানে উপলব্ধি করতে পারি যে তাঁরা কতটা শাস্ত্রবিরোধী। তাই কুবীর গোঁসাইর গানটি নিম্নে বর্ণিত হল:

"মানুষের করণ কর।
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর।।
হরিষষ্ঠী মনসা মাকাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির টিবি সাক্ষী গোপাল
বস্তহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর ?
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষ ভজন
ছেড়ে দাওরে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশ্যে ফের।।
ঘটে পটে দিও না রে মন
পান কর সদা প্রেমসুধা অমূল্যরতন।
গোঁসাই চরন বলে কুবির যদি চিনতে পার।"[৬]

চৈতন্যদেবের মানবমুক্তির আন্দোলনকেই বহন করে নিয়ে গেছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কবি কুবীর গোঁসাই। ঊনবিংশ শতকের সামাজিক মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কুবীর গোঁসাইর অবদান অন্যতম। তিনি ছিলেন বঙ্গানের রচয়িতা এবং পাল্লাদার। বঙ্গান রচনা করতে গিয়ে ইসলামী শাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে কুবীর গোঁসাই আক্ষেপ করেছেন —

"এই মুসলমানের শাস্ত্র জেনে
আমি শূদ্র হইলাম কি কারণে"

সেই সাবেক প্রশ্নটি আর একবার শুনিয়েছেন কবি —

"এই হিন্দু যবন করল কে"?[৭]

এছাড়াও সাহেবধনীদের গীতিকার কুবীর গোঁসাই তার দুটি গানে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ে চমৎকার উক্তি করেছেন-

১. "আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্ম সার।
একাহাতে বাজেনা তালি এক সুরের বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহলাদিনী মর্ম বোঝা হ'ল ভার।"[৮]

২. "একের সৃষ্টি সব পারিনা পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপনসুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।।"[৯]

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের দার্শনিক চেতনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরের উপলব্ধি প্রকাশ করেনি। মানুষের সাথে মানুষের সাম্যভাব বজায় রাখার চেষ্টাও করেছে। তাই যাদুবিন্দু বলেন —

"তুমি সর্বঘটে রও তুমি সর্বরুপ হও
ভালো কথা মন্দ কথা সবই তুমি কও।
কহিছে বিন্দু যাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু।"[১০]

সাহেবধনী সম্প্রদায়েরা 'গুরু সত্য' বলে মনে করেন। তাই তাঁরা গুরুকে গোবিন্দের চেয়ে উপরে রেখেছে তাই গুরু ছাড়া যারা গোবিন্দ ভজে, যাদুবিন্দু তাঁদের ধিক্কার যানিয়েছেন গানের মাধ্যমে —

“গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে
সে পাপীর জায়গা হয় নরকমাঝে।”[১১]

ধর্মের নামে গরীব মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ যাদুবিন্দুর ব্যঙ্গের টানে উক্তি —

“টাকার দেবদেবী গুরু দেবাদি সর্বদা আনন্দে থাকে।
টাকা হলে স্বর্গের সিঁড়ি জগতে নেই টাকার জুড়ি
পরমসুন্দরী নারী যন্ত করে দেয় বুড়াকে।
ও সে সখের জামাই হোক না বুড়ো কথায়
কথায় রয় বেঁকে।।”[১২]

বাংলার লোকধর্মগুলি মানুষকে বিভিন্ন ধর্মীয় বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দিয়েছে গানের মাধ্যমে। সাহেবধনী সম্প্রদায় এই গুলির জন্য অন্যতম অবদান রাখে কুবীর গোঁসাই ও যাদুবিন্দু গোঁসাই। উভয়ের গানের মিশ্রিত রুপ উল্লেখ করা হল —

“হিন্দু আর সবনের করণ বলব এমন কায়।
এরা আসলে ছেড়ে নকল ধরে ঠিক যেমন পাগলের প্রায়।।
ছিল নৈরাকার যখন
ভেসে ছিল নিরন্তর দেখে চিনতে পারলে না দুই জন
হলো ব্রহ্মা বিষ্টু মনোভীষ্ট
শিব কিঞ্চিৎ ধ্যানে পায়।।
কোন কোন মুসলমান ভাই হয়ে বেইমান
খোদাকে ত্যেজ আউলে ভজে
মানে না কোরআন।
ত্যেজে অপহানবি কি আজগুবি
মাশুরির দরগাতে যায়।
এই পৃথিবী সৃজন তাই করেছে যে জন
তারে মানে না জন্মকামনা হিন্দুদের আচরণ।
করে দেবীপূজা ভূতের বোঝা রাত্রিদিন বয়ে বেড়ায়।
যত আউল চাষী পীর তাঁরা করেছেন জাহির
মুসলমান হাজুদ মানে কলা ক্ষীর
দেয় খোদার নামে লবডঙ্কা সালাম করে গবধার পদ্ম।
হিন্দুর অসংখ্য ঠাকুর যেমন পাহাড়ে ভাসুর
নেংটা হয়ে ঘোমটা টাকে লজ্জাকে প্রচুর।
এরা নিজপতি চেনে নাকো উপপতির গুন পায়।।
এই কমলা কালুল্যা সেই আকবতের হেল্যা
মানে নাকো গেল্যা করে এমনি বেলেল্লা
হলোমোর নূরে আনাম পয়দা তার কলাম করে নাহায়।।
এই হিন্দুরা হাবা পূজে দেবী আর দেবা
জন্মেছে যা হ’তে তারে বলে না বাবা।
তাই দেকে শুনে চরণ ভেবে কুঠির কয় হায়রে হরে।।”[১৩]

কুবির গোঁসাই কোনদিন বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান লেখেননি। তাঁর নিজের ধর্মমত ও নিজস্ব বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে গান রচনা করতেন। গৌরাঙ্গ হয়ে ওঠেছিলেন তাঁর কাছে এক প্রতীক কারণ গৌরাঙ্গ শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথার বিনাশক নন, তিনি তাঁদের কাছে মানুষ ভজনের প্রবক্তা। তাঁদের কাছে আরেকটি প্রতিক রাধা-কৃষ্ণ। এই দুই প্রতীক পরস্পরায় বাঁধা। এই নিয়ে কুবির গোঁসাইয়ের একটি উক্তি –

"রাধা কৃষ্ণ ভিন্ন দেহ বলিতে না পারে কেহ
একেই আত্মা কিশোকিশরী।
হংসে হংসিনী সুখবিলাসিনী তেমনই চাঁদের চকোর
পদ্মে ভ্রমর মৌব মৌর।।"[১৪]

সাহেবধনী সম্প্রাদায়ের দুই গীতিকার কুবীর গোঁসাই ও যাদুবিন্দু গোসাই তাদের গান, দর্শন ও ভাবনা চিন্তার প্রতিটি পদে সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে এক সুতোয় বাধতে চেয়েছেন। সমাজের ধর্মীয় বেড়াজালকে ধ্বংশ করার জন্য তাঁরা নিরলস চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্প্রীতির বার্তা বহন করে তা অস্বীকার করা যায় না।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পরিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা: সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বছরের নির্দিষ্ট তিথিতে কয়েকটি অনুষ্ঠান হয়। যেমন বৈশাখী পূর্ণিমায় পাল বাড়িতে উৎসব। দ্বিতীয়টি অগ্রদ্বীপে চৈত্র একাদশীতে সাহেবধনীদের তিন দিনের বার্ষিক সমাবেশ ঘটে। এই অনুষ্ঠানে যে ভোগ দেওয়া হয়, তা মাটির হাড়িতে ও মাটির উনানে রান্না করা হয়। বর্তমানে এই পালনীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটে, যেখানে আগে ভোগ দেওয়ার জন্য রান্না করা হত মাটির হাড়িতে ও মাটির উনানে যা পরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতারন করা হত। কিন্তু এখন শুধুমাত্র ভোগের রান্না মাটির হাড়িতে ও মাটির উনানে করা হয়। আর জনসাধারণের জন্য রান্না করা হয় লোহার কড়াই ও গ্যাসে যার মধ্যে ভোগের প্রসাদ মিলিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে চরণ পালের বংশধরদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়ার কারণে আসনে কে পূজা দেবে এই নিয়ে সমস্যা। এই সম্প্রাদায় অনেক অংশে ছোট হয়ে যাচ্ছে কারণ চরণ পালের বংশধরেরা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনীহা, তাঁরা পড়াশুনা করে চাকরি করছে বা চাকরির চেষ্টা করছে, বা তাঁরা অন্য কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে।

উপসংহার:

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও সংস্কার লোকসমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্যান্য লোকধর্মের মত এই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সাধনের দৃষ্ঠান্ত পাওয়া যায়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ গঠনে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলার নানা লোকধর্মের মত সাহেবধনী সম্প্রদায় গ্রামীন পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে, বিশেষ করে নদীয়া, মুর্শীদাবাদ জেলা জুড়ে এই লোকধর্মের ব্যাপক বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। এদের সাধন পদ্ধতি সহজিয়া এবং মানুষ ভজন হল এদের মূল দর্শন; তাই সাধরণ মানুষ এই ধর্ম মতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রধান গীতিকার কুবীর গোঁসাই ও যাদুবিন্দু গোসাঁইয়ের গান থেকে, সাহেবধনী ধর্মমতের উদারতা স্পষ্ট বোঝা যায়। কুবীর গোঁসাই ও যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের গানে উপলব্ধি করতে পারি যে তাঁরা কতটা শাস্ত্রবিরোধী। তাই পরিশেষে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কার্যপ্রণালী দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলায় যত গৌণধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় অন্যতম সাহেবধনী সম্প্রদায়।

তথ্যদাতা:

১. প্রবীর পাল, বয়স- ৫৮, লিঙ্গ- পুরুষ, চরণ পালের বংশধর, গ্রাম-বৃ ত্তিহুদা, পোষ্টঃ- চাপড়া, থানা- চাপড়া, পিন- ৭৪১১২৩, জেলা- নদীয়া।
২. তিলক পাল, বয়স- ৬৯, লিঙ্গ- পুরুষ, চরণ পালের বংশধর, গ্রাম-বৃত্তিহুদা, পোষ্টঃ-চাপড়া, থানা-চাপড়া, পিন- ৭৪১১২৩, জেলা- নদীয়া।
৩. রাম চন্দ্র পাল, বয়স- ৬৪, লিঙ্গ- পুরুষ, চরণ পালের বংশধর, গ্রাম- বৃত্তিহুদা, পোষ্টঃ- চাপড়া, থানা- চাপড়া, পিন- ৭৪১১২৩, জেলা- নদীয়া।
৪. সন্ধ্যা দাস, বয়স- ৫৩, লিঙ্গ- স্ত্রী, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের শিষ্য, গ্রাম- অগ্রদ্বীপ বাগানপাড়া, পোষ্টঃ-অগ্রদ্বীপ, থানা- চাপড়া, পিন- ৭১৩৫১২, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।
৫. নবকুমার বৈরাগ্য, বয়স- ৬৭, লিঙ্গ- পুরুষ, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের শিষ্য, গ্রাম-বৃত্তিহুদা, পোষ্টঃ-চাপড়া, থানা- চাপড়া, পিন- ৭৪১১২৩, জেলা- নদীয়া।

৬. চিন্তা ঘোষ, বয়স- ৭০, লিঙ্গ- স্ত্রী, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের শিষ্য, গ্রাম-অগ্রদ্বীপ বাগানপাড়া, পোষ্টঃ-অগ্রদ্বীপ, থানা-কাটোয়া, পিন- ৭১৩৫১২, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।

৭. উত্তম ঘোষ, বয়স- ৩৬, লিঙ্গ-পুরুষ, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের শিষ্য, গ্রাম-অগ্রদ্বীপ বাগানপাড়া, পোষ্টঃ-অগ্রদ্বীপ, থানা- কাটোয়া, পিন- ৭১৩৫১২, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ: ৩৩।

২. শেঠ, সোমা। বাংলার লোকধর্ম। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৭, পৃ: ৪১।

৩. শেঠ, সোমা। বাংলার লোকধর্ম। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৭, পৃ: ৪১।

৪. শেঠ, সোমা। বাংলার লোকধর্ম। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৭, পৃ: ৪১।

৫. প্রামাণিক, প্রবীর। নদীয়া জেলার লোকধর্ম। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ: ৭২।

৬. প্রামাণিক, প্রবীর। নদীয়া জেলার লোকধর্ম। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ: ৭৩।

৭. হোশেন, মোশাওরফ। ও পাত্র, সাধন (সম্পা.) । রুপসাগর। ২০২১, পৃ: ৮।

৮. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ: ৯-১০।

৯. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ: ৯-১০।

১০. শেঠ, সোমা। প্রসঙ্গ: বাংলার লোকধর্ম। কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ২০০৭, পৃ: ৪২।

১১. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ: ১০৮।

১২. প্রামাণিক, প্রবীর। নদীয়া জেলার লোকধর্ম। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০, পৃ: ৭৫।

১৩. প্রামাণিক, প্রবীর। (গবেষণা অভিসন্দর্ভ) নদীয়া জেলার লোকধর্ম ও তার সাহিত্য। কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ: ৮১-৮২।

১৪. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ: ১৩২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চক্রবর্তী, সুধীর। সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫

২. চক্রবর্তী, বরুনকামার। (সম্পা.) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭

৩. চৌধুরী, দুলাল। (সম্পা.) বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর। কলকাতা, ২০০৪

৪. দাস, অলেকেশ। বিশ্বাস, রমা। ও অন্যান্য (সম্পা.) নদীয়ার ইতিবৃত্ত। দশম কল্যাণী বইমেলা, কল্যাণী, ২০০৬

৫. প্রামাণিক, প্রবীর। নদীয়া জেলার লোকধর্ম। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

৬. প্রামাণিক, প্রবীর। (গবেষণা অভিসন্দর্ভ) নদীয়া জেলার লোকধর্ম ও তার সাহিত্য। কল্যাণী: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩

৭. শেঠ, সোমা। প্রসঙ্গ: বাংলার লোকধর্ম। পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৭

৮. রায়, মোহিত। (সম্পা.) নদীয়া-কাহিনী। পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ১৯৯৮

সহায়ক ওয়েবসাইট:

https://www.ebanglalibrary.com/lessons/৩-বাংলার-লোকধর্ম/#google_vignette

https://in.search.yahoo.com/yhs/search?p= লোকধর্ম%20ও%20সাম্প্রদায়িক%20সম্প্রীতি

https://in.search.yahoo.com/yhs/search?p=%নদীয়ার%20লোকধর্ম%20কেন্দ্রিক%20লোকচার%20ও%20সাম্প্রদায়িক%20সম্প্রীতি